Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIV, Issue-III, April 2026, Page No. 192-198
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.14.issue.03W.097

উনিশ শতকের গীতিকবিদের সৃজনে স্বদেশচেতনা ও দেশাত্মবোধ: জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের সলতে পর্ব

মহেন্দ্র নাথ পাল, *গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.04.2026; Accepted: 29.04.2026; Available online: 30.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The nineteenth century marks the era of the Renaissance in the history of Bengal. Intrinsic to the very essence of this Renaissance were the patriotism, nationalist consciousness, and love for the homeland shared by Bengal and its people. During the nineteenth century, a distinct circle emerged among poets, writers, artists, lyricists, composers, and vocalists—individuals who, steeped in the spirit of patriotic love, honed and refined the ethos of nationalism. Their primary objective was to project this national consciousness through the medium of their creative works. Prominent among these renowned nineteenth-century Bengali poets were Dwijendralal Ray, Rajanikanta Sen, and Atulprasad Sen, among others. Through their numerous poems and songs, they paid homage to the motherland—at times celebrating the pride of the soil, at others the heritage of the language, and frequently the tender affection of a mother. This essay offers an artistic exploration of these very works. Through these poems, a fervent love for the Motherland, a deep attachment to the native soil, and an intense devotion to the language are articulated with resounding clarity. It was precisely because they—during this nascent phase of nationalist sentiment—took the initiative to kindle the flame, that a spontaneous and abundant stream of nationalism was subsequently able to flow through the pens of later generations of artists and writers. In this regard, the artistic community of later eras remains indebted to the lyric poets of the nineteenth century. In the early twentieth century, this body of literature emerged as a potent weapon in the anti-Partition movement that swept across Bengal. Their writings resonate with the call to boycott foreign goods and to embrace indigenous products. Their poetry articulates a sense of self-pride regarding the inherent beauty and rich heritage of the Bengali language. The manifold achievements and globally acclaimed identity of Bengal and Mother India were transformed into exquisite works of art through the pens of these poets. Thus, through the vast body of work created across the nineteenth and twentieth centuries, these numerous lyric poets unleashed a veritable flood of patriotism, national consciousness, and nationalist fervor.

Keywords: The 19th Century, the Bengal Renaissance, Patriotism, National Consciousness, the Soil of Bengal, the Sweetness of Language, Maternal Affection, Swadeshi and Boycott, the Incipient Phase of National Sentiment

‘দেশ’ হল আমাদের কাছে এক গভীর অনুভূতি। দেশ মানে ভালোবাসা, দেশ মানে মাটি। দেশ মানে শিকড়ের টান। সেই দেশকে কাটাছেঁড়া করা দেশবাসীর কাছে এক মস্ত বড় আঘাত। সেই আঘাতই নেমে এসেছিল

১৯০৫- এর বঙ্গভঙ্গের মধ্য দিয়ে। লর্ড কার্জনের প্রশাসনিক কূটনীতিতে দ্বিখণ্ডিত হল বাংলা। বাংলা মায়ের জীবনে এ এক মহৎ বিপর্যয়। সে বিপর্যয়ের অন্ধকার কালিমালিপ্ত করে দিয়েছিল ভারতের ভাগ্যাকাশকে। স্বাভাবিকভাবেই সেই অন্ধকারময় যুগে দাঁড়িয়ে শিল্পী-সাহিত্যিকদের সচেতন মন সেদিন স্থির থাকতে পারেনি। তাঁরা কলমকেই করে নিয়েছিলেন তাঁদের আবেগ, অনুভূতি ও প্রতিবাদের অস্ত্র। তবে এই বাংলা দেশপ্রেমমূলক কবিতার উদ্ভব উনিশ শতকের মধ্যভাগেই। তার বিস্তার বর্তমান কাল পর্যন্ত। আধুনিক যুগেই বাঙালি কবিরা দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদের তাৎপর্য উপলব্ধি করেছেন নতুনভাবে। কারণ উনিশ শতকের নবজাগরণ ও জাতীয়তাবাদী চেতনাই তাঁদের স্বদেশপ্রেমের তাৎপর্য অনুভবের অনুঘটক হয়ে কাজ করেছে। আসলে ব্রিটিশ দেশপ্রেমই ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ও ভারতীয় স্বদেশচেতনাকে জাগ্রত করেছিল নতুন করে। নবজাগরণ ও উনিশ শতকের পূর্বে আলাদা করে স্বদেশকে বন্দনা করার প্রয়াস ততটা গভীরভাবে তাই দেখা যায়নি। হয়তো ইংরেজি কবিতার মতো গভীর স্বদেশপ্রেমের চেতনা বাংলা দেশপ্রেম কবিতায় ছিল না। কিন্তু দেশমাতৃকার রূপ বন্দনার মধ্য দিয়ে সেই স্বাদেশিকতাবোধ গভীর মাত্রা লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে সম্পাদক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলা গীতিকবিতা: উনিশ শতক’ গ্রন্থের ‘ভূমিকা’য় বলেছেন-

> “ইংরেজি দেশপ্রেমের দৃঢ় ও সংগ্রামী চেতনা, দম্ভ ও আত্মবিশ্বাস সেদিন বাংলা দেশপ্রেমের কবিতায় ছিল না, কিন্তু তার ক্ষতিপূরণ হয়েছে দেশমাতৃকার রূপধ্যানে।”[১]

এক্ষেত্রে এরকমই নির্বাচিত কয়েকটি কবিতা নিয়ে বাংলা গীতিকবিতায় দেশপ্রেমচেতনা বিষয়টি আলোচনা করা হবে।

এই স্বদেশপ্রেমের কবিতার উদ্ভব ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যবিন্দুতে হলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রচিত কবিতাগুলিও স্বাদেশিকতাবোধের অন্যতম পরাকাষ্ঠা হয়ে উঠেছে। এই সমস্ত কবিতাগুলি বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত হলেও এদের কবিরা যেহেতু উনিশ শতকের গীতিকবি হিসেবে পরিগণিত; তাই সম্পাদক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর ‘বাংলা গীতিকবিতা: উনিশ শতক’ গ্রন্থটিতে এই সমস্ত গীতিকবিতাগুলিকেও স্থান দিয়েছেন। এরকমই কয়েকটি গীতিকবিতা হল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ‘আমার দেশ’, রজনীকান্ত সেনের ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়’ এবং অতুলপ্রসাদ সেনের ‘বাংলা ভাষা’। এই কবিতাগুলি অবলম্বনে কবিদের স্বদেশপ্রীতি ও মাতৃভাষাপ্রীতির নিদর্শন দেওয়া হবে। ওই যুগের দেশপ্রেমের কবিতাগুলিকে মূলত পাঁচটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। যথা- ১) বঙ্গভূমির চিন্ময়ী মাতৃরূপ বন্দনা, ২) অখণ্ড ভারতের অধিষ্ঠাত্রী ভারতজননীর বন্দনা, ৩) পরাধীনতা থেকে মুক্তি লাভের জন্য বিলাপ, ৪) দেশসেবায় জীবন উৎসর্গের উৎসাহ দান ও প্রেরণা, ৫) মাতৃভাষার বন্দনা। আমাদের আলোচ্য দ্বিজেন্দ্রলালের ‘আমার দেশ’ কবিতাটি এই ভাগের প্রথম পর্যায়ে, রজনীকান্ত সেনের ‘মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়’ কবিতাটি চতুর্থ পর্যায়ে এবং অতুলপ্রসাদ সেনের ‘বাংলা ভাষা’ কবিতাটি পঞ্চম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এখন এই তিনটি কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩) একাধারে নাট্যকার, গীতিকার ও কবি। নাট্যসাহিত্যের পাশাপাশি কবি ও গীতিকার হিসেবেও তিনি যথেষ্ট সফল। উনিশ শতকের গীতিকবিতার মেজাজে তিনি রচনা করলেন শিল্প-সম্মত সব গান ও কবিতা। যেসব কবিতায় বারবার ছুঁয়ে যায় স্বাদেশিকতাবোধ। জাতীয়তাবাদী চেতনা যার পরতে পরতে। তাঁর এমন একটি কবিতা হল ‘আমার দেশ’। সেখানে বঙ্গভূমিকে মাতৃরূপে বন্দনা করা হয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা স্বদেশপ্রেমের কবিতার প্রথম ভাগের মধ্যে পড়ে এই কবিতাটি। ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচার, বিভাজন ও শোষণের ফলে বঙ্গমাতা তথা দেশমাতা যে কতটা বিধ্বস্ত; তা কবি দেখালেন এখানে। মায়ের নয়ন ও কেশে ধূলিমলিন শুষ্কতা ও রুক্ষতা। ব্রিটিশ শাসনের আমলে স্বদেশ মাতৃকাকে অপমান করার পরিণতিতেই মায়ের মলিনতা প্রকাশ্যে এসেছে। তাই কবির প্রশ্ন -

"বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ!
কেন-গো মা তোর শুষ্ক নয়ন, কেন-গো মা তোর রুক্ষ কেশ?"[২]

কবি এই অনুষঙ্গে ব্যক্ত করেছেন দেশমাতৃকার সুপ্রাচীন মহিমার কথা। ভারতবর্ষ যে ধ্যানে, জ্ঞানে, ঐতিহ্যে বিশ্বসেরা; সে কথাই তিনি পদে পদে মনে করিয়ে দিয়েছেন দেশবাসীকে। যেখানে গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও সাধনার মাধ্যমে ভারতকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। আর সেই মহিমা তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন আন্তর্জাতিক স্তরে। একইভাবে সম্রাট অশোক তাঁর কৃতিত্ব ভূ-ভারতে, এমনকি ভারতের বাইরেও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। ভারতীয় বিজয়-সেনানী লঙ্কা জয় করেছিল। বাংলার বীর বিজয় সিংহ লঙ্কা জয় করে তার নাম রাখলেন সিংহল। ভারত একসময় উপনিবেশ স্থাপন করল চীন, তিব্বত, জাপানে। ভারতের বিশ্বনন্দিত কৃতিত্ব উঠে এলো কবিতাটির অণু পরমাণুতে। এভাবে ভারতের মহিমা কবিকণ্ঠে ব্যক্ত। যা তাঁর তীব্র দেশপ্রেম ও স্বদেশ ভাবনার পরিচায়ক।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেছেন এই ভূমিতেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩) মতো ভক্তিবাদী প্রাণপুরুষ। তিনি স্বদেশভূমিতে ভক্তিবাদ ও মানবতাবাদের প্লাবন এনেছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে হওয়া ভক্তিবাদী আন্দোলন ও সমস্ত মানুষকে কাছে টেনে নেওয়ার জোয়ার সৃষ্টিতে তিনি বিশ্ববরেণ্য। চণ্ডীদাসের লেখা বৈষ্ণব পদ বাঙালি কবি হিসেবে তাঁকে প্রসিদ্ধ করে তুলল। যে পদ রাধার মরমী মনের সুখ-দুঃখের অনুভবে আজও পাঠকের কাছে অনুরঞ্জিত। প্রতাপাদিত্যের বীরত্ব ইতিহাসের মর্মস্পর্শী কাহিনী। তাই সেই গৌরবের কথা মনে করিয়ে কবি বলতে চেয়েছেন বঙ্গমাতা তথা ভারতমাতার এতে মলিন হওয়ার কিছু নেই। যে মায়ের সন্তানদের এত গৌরব; সেই মায়ের মলিনতাটা খুব লজ্জার। তাই ভারতমাতাকে ব্রিটিশ অপশাসনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে কবির ত্রিশ কোটি দেশবাসীর প্রতি স্বাদেশিক আহ্বান -

"কীসের দুঃখ, কীসের দৈন্য, কীসের লজ্জা, কীসের ক্লেশ।
ত্রিংশ-কোটি মিলিত-কণ্ঠে ডাকে যখন - "আমার দেশ"।।"[৩]

এভাবে ভারতমাতার আত্মগর্বিনী হওয়ার কারণ ও নিদর্শনগুলি কাব্যিক স্তর-পরম্পরায় তুলে এনেছেন কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। তিনি বলতে চেয়েছেন বঙ্গমাতা তথা ভারতমাতা আজ যতই পদদলিত হন না কেন; তাঁর নিজস্ব ঐতিহ্য ও পরাক্রমই তাঁর মালিন্য-মুক্তি ঘটাবে। তাই তিনি বঙ্গভূমির একটা মাতৃপ্রতিম রূপ দিয়ে তাঁকে বন্দনা করেছেন দেবীর মতো করে। যে দেবীর রূপসৌন্দর্য ও গরিমায় দেশবাসীর আত্মগর্বী হয়ে ওঠার যথেষ্ট হেতু রয়েছে। তখন যেহেতু বঙ্গভূমিকে কেন্দ্র করেই প্রধানত ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অঙ্কুরোদগম ঘটেছিল; তাই বঙ্গমাতার রূপ এখানে ভারতমাতার রূপেরই সমার্থক। এ যেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা 'ভারতমাতা' ছবির কাব্যিক রূপ। বঙ্গভূমিকে মাতৃরূপে বন্দনা করার নিদর্শন আরো বেশ কিছু উনিশ শতকীয় গীতিকবিতায় দেখা যায়। যেমন মধুসূদনের 'বঙ্গভূমির প্রতি', অক্ষয়কুমার বড়ালের 'বঙ্গভূমি', সুরমাসুন্দরী ঘোষের 'বঙ্গজননী' ইত্যাদি। আমাদের আলোচ্য দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' কবিতাটিও তাই স্বদেশ প্রেমের কবিতার প্রথম ভাগের মধ্যেই পড়ে। দ্বিজেন্দ্রলালের বিচিত্র ধারার দেশপ্রেমমূলক আরো কয়েকটি কবিতা বা গান হল 'বঙ্গভাষা', 'জন্মভূমি', 'কেন মা তোমারি', 'ভারত আমার' ইত্যাদি। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিখ্যাত গান– 'ধনধান্য পুষ্প ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা/ তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা'- যা জাতীয়তাবাদী ভাবধারা, স্বদেশ চেতনা ও দেশাত্মবোধের এক অন্যতম নিদর্শন হয়ে আজও বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে উজ্জ্বল। যেখানে বাংলা তথা ভারতবর্ষ তাঁর ঐতিহ্য, প্রীতি, পরম্পরায় জগত সভায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দাবিদার হয়ে উঠেছে।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা আরেকটি গান তথা কবিতা হল রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০) 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'। রজনীকান্ত গীতিকার হিসেবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। তাঁর কবিতার অণু-পরমাণুতে মিশে আছে স্বদেশপ্রেমের ভাব। যখন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয় স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন; ঠিক তখনই শিল্পী হিসেবে কবি রজনীকান্ত সেন কলম ধরলেন সেই আদর্শে। এই আদর্শকে দুটি শব্দ দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। তা হল 'স্বদেশী' ও 'বয়কট'। এই স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনে বলা হয়, বিদেশী দ্রব্যের বর্জন সম্ভব না হলে স্বদেশী দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে না। আর ক্রমাগত বিদেশী দ্রব্য ব্যবহৃত হতে থাকলে ব্রিটিশ সরকারের অর্থনীতি আরো মজবুত হবে এবং দেশীয় অর্থনীতি ক্রম-সংকুচিত বা কোণঠাসা অবস্থানেই থাকবে। তাই সেক্ষেত্রে বিদেশী দ্রব্য বয়কটের ডাক দেওয়া হয় এবং স্বদেশী জিনিস বা দ্রব্য গর্বের সঙ্গে মাথায় তুলে নেওয়ার কথা বলা হয়। তবে শুধুমাত্র বিদেশী দ্রব্য নয়; বিদেশী আদব-কায়দা, বিদেশী আদর্শ সবকিছুই বর্জনের কথা বলা হয়। পুরো বিষয়টি কবি তুলে ধরেছেন খুব সূক্ষ্মভাবে। সেই আদর্শ কবি রজনীকান্ত সেন তাঁর কবিতায় ছড়িয়ে দিয়ে বলেছেন -

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।"[৪]

এভাবে কবি দেশমাতৃকার উৎপাদিত দ্রব্য ব্যবহারের পক্ষপাতী। ফলে সম্পূর্ণ কবিতাটিতে এইভাবে স্বদেশী আন্দোলনের এক আবহাওয়া তৈরি হয়েছে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে সংঘটিত হওয়া এই স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের মহড়া যে শুধুমাত্র রাজনৈতিক সভা-সমিতির মধ্য দিয়েই তৈরি হয়নি; সাহিত্য ও শিল্পমাধ্যমও যে এই বিপ্লবের অন্যতম অস্ত্র ছিল, এই কবিতাটি তারই অন্যতম প্রমাণ।

বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে ১৯০৫ সালে। আর কবিতাটির রচনাকালও ১৯০৫। ফলে সমকাল বিন্দুতে দাঁড়িয়ে সেই স্বদেশী ভাবাবেগ কবিতাটিতে অনেক বেশি সতেজ। বাংলার মাটিকে তখন টুকরো টুকরো করে দেওয়ার হিসেবী ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনকে দমিয়ে দেওয়ার এক অপচেষ্টা তখন শাসকের মস্তিষ্ককে গ্রাস করেছে। বাংলার অর্থনৈতিক শিরদাঁড়া ও স্বাধীনতাকে ভেঙে দেওয়ার প্রয়াসে শাসক তখন মশগুল। সেই বিপর্যস্ত পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি রজনীকান্ত সেন এই দেশমাতৃকাকে 'দীন-দুঃখিনী' বলে সম্বোধন করেছেন। স্বদেশী মায়ের কাপড় আপাতভাবে স্থূল ও অশৌখিন হলেও তার সাথে মিশে আছে মায়ের ভালোবাসা, স্নেহ, মায়া, মমতা ইত্যাদি। স্বদেশের মোটা সুতোই এখানে মায়ের স্নেহতে পর্যবসিত হয়েছে। ঝাঁ-চকচকে বিদেশী অতি-মসৃণ বা সূক্ষ্মবস্ত্রকে কবি ভিক্ষা সামগ্রী বলে মনে করেন। কারণ তাতে 'নিজত্ব' মিশে নেই। নেই আপন অস্মিতা। নিজের মায়ের গৌরবে, মাতৃত্বে গর্বিত এবং আনন্দিত হওয়ার মতো সার্থকতা আর কিছুতেই নেই। স্বদেশী সাবান, মোজা এসবের সঙ্গে জড়িত স্বদেশ মায়ের মাতৃত্ব। সেইজন্য অপরের দ্রব্য বর্জনের মধ্য দিয়ে কবি স্বাদেশিক প্রত্যয়ে বলেন –

"আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা ক'রব ভাই;
পরের জিনিস কিনবো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।"[৫]

রজনীকান্ত সেনের এই 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' কবিতাটিতে দেশ সেবায় জীবন উৎসর্গের ও বলিদানের উচ্চ আদর্শ, উৎসাহদান এবং প্রেরণা লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ এটি দেশপ্রেমের কবিতার চতুর্থ ভাগের মধ্যে

পড়ে। এরকম আরো কয়েকটি কবিতা হল অতুলপ্রসাদ সেনের 'বল, বল, বল সবে', 'হও ধরমেতে ধীর', গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'ঋণশোধ', স্বর্ণকুমারী দেবীর 'শতকণ্ঠে কর গান', জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চল রে চল সবে' ইত্যাদি। অর্থাৎ ওই সময় দাঁড়িয়ে জাতীয়তাবাদী ও দেশাত্মবোধক সাহিত্য রচনা যে প্লাবন সৃষ্টি হয়েছিল সে কথা বলাই যায়।

কবি অতুলপ্রসাদ সেনও (১৮৭১-১৯৩৪) রজনীকান্তদের সমসাময়িক কালের বিখ্যাত গীতিকার ও কবি। তাঁর গীতিকবিতাও বাংলা ভাষা ও স্বদেশ প্রীতির মাধুর্যে ভরপুর। তাঁর লেখা 'বাংলা ভাষা' কবিতাটিও ভাষাপ্রীতির অনন্য দস্তাবেজ। কবিতাটিতে আছে মাতৃভাষার বন্দনা। তাই কবিতাটি স্বদেশ প্রেমের কবিতার পঞ্চম ভাগের মধ্যে পড়ে। কবি অতুলপ্রসাদ সেন বাংলা ভাষার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছেন আপন গৌরবের মাধুর্য। বাংলা ভাষার মাধুর্য ও সংহতিবোধ কবিকে দিয়েছে সুখ, শান্তি ও ভালোবাসার স্পর্শ। বাংলা ভাষার এক অপরিসীম সম্মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ ও আচ্ছন্ন কবি। বাংলা গানের যাদু নৌকাবাহক মাঝির পরিশ্রম লাঘবের শক্তি জোগায়। কৃষকের শ্রম লাঘব হয় বাংলা ভাষার গানে। বাউলের নৃত্যদোদুল ছন্দ আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ করে। বাংলা ভাষায় নিতাই-গৌরাঙ্গের কীর্তন ও ভক্তিরসের প্লাবন এক অপরিমেয় আনন্দ দেয়। আশ্চর্য সুধাবর্ষী এই বাংলা ভাষা। এই ভাষা সর্বদুঃখ বিনাশী। কবি এই ভাষার প্লাবনেই নিজের দেশপ্রীতিকে সম্পৃক্ত করেছেন–

"মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে, তোমার বোলে, কতই শান্তি ভালোবাসা!"[৬]

আসলে কবি অতুপ্রসাদ এখানে বলতে চেয়েছেন মাতৃভাষার সেবা হল দেশমাতৃকার সেবা। কারণ সামগ্রিক স্বদেশচেতনা; ভাষাকে বাদ দিয়ে নয়। বঙ্গভাষারও মাধুর্য নিয়ে বঙ্গমাতৃকার মূর্তি পরিকল্পিত। তাই এখানে ভাষাপ্রীতি হল স্বদেশপ্রীতিরই নামান্তর। যেখানে বঙ্গদেশ ও বঙ্গভাষা মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। যেখানে ভাষা ও মা-মাটি-মানুষের প্রতি ভালোবাসাই হ'য়ে থাকে একমাত্র সত্য। যে ভাষার অধিকার রক্ষার জন্যই বিশ্বের ইতিহাসে প্রাণ ও রক্ত দেওয়ার মতো অনবদ্য নজির স্থাপিত হয়েছে বারবার– সেকাল থেকে একালে; সেই ভাষাকে নিয়ে অবশ্যই আত্মগর্বিতা অনুভব করার বাহুল্য আছে বৈকি!

'বাংলা ভাষা' কবিতায় কবি অতুলপ্রসাদ সেন বলেছেন- বাংলা ভাষাতেই বৈষ্ণব পদকর্তা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, গোবিন্দদাসের মতো একাধিক কবি। বিদ্যাপতির মাথুরের পদ, চন্ডীদাসের পূর্বরাগ ও আক্ষেপানুরাগের পদ, গোবিন্দদাসের অভিসারের পদ প্রতিটি বাঙালির হৃদয় কাড়ে। এই মাধুর্য আজও বাঙালি পাঠকের মনকে এক শান্ত ছায়াবীথি তলে হাজির করে। বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গনে এভাবে এই মাধুর্যময় ভাষার অজস্র মণিমুক্তা ছড়িয়ে আছে। এই ভাষার অন্যতম মহাকবি ও আখ্যানকবিরা হলেন মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ। মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য', হেমচন্দ্রের বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' কাব্য, নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্য আজও বাঙালির হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। এই বাংলা ভাষারই প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। যিনি বাংলা উপন্যাসের প্রথম সার্থক প্রণেতা। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী' ইত্যাদি উপন্যাসগুলি চিরকালের আদৃত সাহিত্য। এই সমস্ত সাহিত্যিকেরা বাংলা ভাষার ফুলেই মধু পান করে সমৃদ্ধ করেছেন সাহিত্য ভান্ডারকে। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার জিতে বিশ্বের দরবারে বাংলা ভাষাকে পৌঁছে দিয়েছেন। আর এই ভাষাতেই তো আমাদের প্রতিটি বাঙালি সন্তানের প্রথম 'মা-মা' ডাক। আর এই ভাষাতেই 'হরি হরি বোলে' জীবনের সাঙ্গসুর। কবি অতুলপ্রসাদ সেনের অনুভূতি কবিতায় ধরা পড়েছে এইভাবে –

"ঐ ভাষাতেই প্রথম বোলে, ডাকনু মায়ের "মা, মা" ব'লে;
ঐ ভাষাতেই বলবো হরি, সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা।।"[৭]

এরকম মাতৃভাষা বন্দনার নিদর্শন পাওয়া যায় উনিশ শতকের আরো বেশ কিছু কবিতায়। যেমন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'মাতৃভাষা', মধুসূদন দত্তের 'বঙ্গভাষা', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'বঙ্গভাষা', মানকুমারী বসুর 'বাণীবন্দনা' ইত্যাদি। কবি অতুলপ্রসাদ সেনের সামগ্রিক স্বদেশচিন্তা ও দেশাত্মবোধ প্রকাশিত হয়েছে আরও বেশ কয়েকটি কবিতা ও গানে। সেগুলি হল 'ভারতলক্ষ্মী', 'বল, বল, বল সবে', 'হও ধরমেতে ধীর' ইত্যাদি। এরকম করেই অতুলপ্রসাদদের কলম জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ সৃষ্টির সলতে পর্বে এক সাহিত্যিক উত্তরণ সৃষ্টি করেছিল।

সবশেষে বলা যায়, এইভাবে তিন কবি স্বদেশভূমি ও দেশমাতৃকার প্রতি তাদের হৃদয়ের টানকে ব্যক্ত করলেন। যে অনুভবে কোনো কৃত্রিমতা মিশে নেই। আছে কেবল দেশকে ভালোবাসার, মাটিকে ভালোবাসার, ভাষাকে ভালোবাসার এক গভীর প্রত্যয় ও প্রত্যাশা। সেই অনুভবেই কবিতাগুলি আজও হৃদয়গ্রাহী। এই কবিতা ও গানগুলি গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনার কাব্যিক প্রতিফল রূপে। নবজাগ্রত চেতনা ও আত্মজাগরণই এক্ষেত্রে কবিদের দেশ প্রেমের প্রেরণা যুগিয়েছে। এই প্রসঙ্গে সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য' গ্রন্থে বলেছেন–

"তৎকালীন কবিদের দেশপ্রেমের প্রেরণা ছিল আত্ম-উদ্বোধন ও আত্মবিশ্বাসের প্রেরণা। ইহারই ফলে সেদিন অসংখ্য স্বদেশী গান ও কবিতা রচিত হইয়াছিল।"[৮]

আসলে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মানুষের মনে একটু একটু করে জেগে উঠতে থাকা নতুন চেতনা ও দেশাত্মবোধ; কবিদের এই আত্ম-উদ্বোধনে অনুপ্রেরিত করেছিল এবং নতুন করে আত্ম-জাগৃতি ঘটিয়েছিল। উনিশ শতকের নবজাগরণের একটি অন্যতম বহিঃপ্রকাশিত রূপই ছিল স্বদেশপ্রীতি। প্রসঙ্গত বলা যায়, বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগের জাতীয়তাবাদী ভাবধারা রবীন্দ্রসাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছিল বিশেষভাবে। রবীন্দ্রনাথের একাধিক গানে ও কবিতায় সেই দিকটি প্রকাশিত। যেমন 'বাংলার মাটি, বাংলার জল,/ বাংলার বায়ু, বাংলার ফল/ পুণ্য হউক পুণ্য হউক/ পুণ্য হউক হে ভগবান', 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'। শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানেই নয়, রবীন্দ্র উপন্যাস সাহিত্যেও স্বদেশী আন্দোলনের ঝাঁজ ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা প্রকাশিত। যেমন তাঁর 'ঘরে-বাইরে' (১৯১৬) ও 'গোরা' (১৯১০) উপন্যাস দুটি এই জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগের অন্যতম নিদর্শন। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে দেখলাম নিখিলেশের প্রকৃত দেশপ্রেম দেশ বাঁচানোর আদর্শে অবগাহন করেছে। পক্ষান্তরে সন্দীপের ভন্ড দেশপ্রেম আত্মসিদ্ধির উপায় খুঁজেছে। 'গোরা' উপন্যাসে গোরার ভারত বোধ ও দেশচেতনা প্রাথমিক পর্বের জাতীয়তাবাদী ভাবধারার অন্যতম নিদর্শন। যাই হোক সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, উনিশ শতকের গীতিকবিদের এই সমস্ত স্বদেশপ্রেমের কবিতাগুলি; আমাদের দেশে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে সৃষ্ট বিবিধ জাতীয়তাবাদী প্রেক্ষিত ও স্বাদেশিক আদর্শকে উপস্থাপিত করছে। সেই অনুপ্রেরণায় দেশবাসীও উজ্জীবিত হয় স্বদেশ প্রীতির ভাবধারায়। যা অক্ষরে অক্ষরে সেই সময়ের ইতিহাসকে স্পর্শ করেই গড়ে উঠেছে। যার প্রতিটি অণু পরমাণু জুড়ে রয়েছে স্বাদেশিকতার এসেন্স। সেই বিচারে কবিতাগুলি ওই ঐতিহাসিক যুগের প্রামাণ্য দলিল হিসেবেও প্রতিফলিত। যা এই সমস্ত কবিদের স্বদেশ ভাবনার ও জাতীয়তাবাদী ভাবাদর্শের গীতিকাব্যিক দর্পণ। যে অনুভবে এক হয়ে যায় ভাষা, দেশ, মাটি ও মা।

তথ্যসূত্র:

১. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। 'ভূমিকা'। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পাদনা)। 'বাংলা গীতিকবিতা: উনিশ শতক'। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, পরিমার্জিত নবম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০২২, কলকাতা, পৃ. ১৬।

২. রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল। 'আমার দেশ'। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পাদনা)। 'বাংলা গীতিকবিতা: উনিশ শতক'। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, পরিমার্জিত নবম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০২২, কলকাতা, পৃ. ৩৩০।

৩. তদেব, পৃ. ৩৩১।

৪. সেন, রজনীকান্ত। 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়'। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পাদনা)। 'বাংলা গীতিকবিতা: উনিশ শতক'। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, পরিমার্জিত নবম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০২২, কলকাতা, পৃ. ৩৩৭।

৫. তদেব, পৃ. ৩৩৭।

৬. সেন, অতুলপ্রসাদ। 'বাংলা ভাষা'। মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার (সম্পাদনা)। 'বাংলা গীতিকবিতা: উনিশ শতক'। ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, পরিমার্জিত নবম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০২২, কলকাতা, পৃ. ৩৪০।

৭. তদেব, পৃ. ৩৪১।

৮. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার। 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য'। দে'জ পাবলিশিং, পুনর্মুদ্রণ, মার্চ ২০১৭, কলকাতা, পৃ. ১৬৮।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. বসু, স্বপন। 'বাংলায় নবচেতনার ইতিহাস'। পুস্তক বিপণি, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৫, কলকাতা।

২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর। 'পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর: আধুনিক ভারতের ইতিহাস' (অনুবাদ: কৃষ্ণেন্দু রায়)। ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, ২০২২, হায়দ্রাবাদ।

৩. দে, মাধবী। 'বাংলা কবিতার পর্বান্তর: উনিশ শতক'। প্রজ্ঞা বিকাশ, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৯, কলকাতা।

৪. সরকার, সুশোভন। 'বাংলার রেনেসাঁস'। দীপায়ন, পঞ্চম সংস্করণ, নভেম্বর ২০১১, কলকাতা।

৫. মণ্ডল, নিমাই চন্দ্র। 'ইতিহাসের আলোয় বাংলায় রাজনৈতিক আন্দোলন ও অস্থিরতা-সংঘর্ষ'। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১৮, কলকাতা।

৬. মুখোপাধ্যায়, শক্তিসাধন। 'ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে বাংলার রেনেসাঁস'। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০০০, কলকাতা।